আপন শিষ্যদের সাথে হযরত মসীহ মওউদ ও ইমাম মাহদী (আ.)-এর দয়া ও সহমর্মিতার আচরণ

মাওলানা রশিদ আহমদ
শিক্ষক, জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ

আল্লাহ্ তা'লার নবী-রসূল প্রেরণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো, সৃষ্টির প্রতি দয়া ও সহমর্মিতা প্রদর্শন করা। আর সেই দয়া-মায়া ও সহমর্মিতার ধরণ এমন হয়ে থাকে যে, তাঁরা অর্থাৎ নবী-রসূলগণ এর জন্য নিজ জীবন বিলীয়ে দিতেও কুণ্ঠা বোধ করেন না। সেই দয়া-মায়ার প্রথম ও শেষ স্তর হলো খোদা তা'লার বান্দারা যেন খোদা তা'লার সত্যিকার ইবাদতগুজার বান্দায় পরিণত হয়। কারণ, এর মাঝেই বান্দার দুনিয়া ও আখেরাতের সকল সফলতা নিহিত। আর হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের এই দয়া ও সহমর্মিতার প্রতি ইশারা করে কুরআন মজীদে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন,

لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ

অর্থাৎ- তারা মুমিন হচ্ছে না বলে তুমি কি নিজ প্রাণ বিনাশ করে ফেলবে? *(সূরা শোআরা: ৪)*

লোকদের প্রতি কোমলচিত্ততা আল্লাহ্ তা'লার কৃপারই ফল হয়ে থাকে। আর নবী-রসূলগণ কোমলচিত্ত হওয়ার কারণে লোকেরা তাদের আশেপাশে একত্রিত হয়। তাঁরা কঠোর ও রুক্ষ হলে তাদের প্রেরণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণ হতো না। আল্লাহ্ তা'লা এই বিষয়ের প্রতি রসূল করীম (সা.)-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করে সূরা আলে ইমরানের ১৬০ নং আয়াতে বলেন,

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ

অর্থাৎ আর আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে পরম কৃপার কারণে তুমি তাদের প্রতি কোমলচিত্ত হয়েছ। আর তুমি যদি রুক্ষ ও কঠোরচিত্ত হতে তাহলে নিশ্চয় তারা তোমার আশপাশ থেকে সরে পড়তো।

আল্লাহ্‌র প্রেরিত সকল মহাপুরুষের ন্যায় হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী ইমাম মাহদী ও মসীহ মওউদ (আ.) নানান গুণের অধিকারী ছিলেন। তাঁর (আ.) শিষ্য হযরত ডা. মীর মোহাম্মদ ইসমাঈল সাহেব (রা.) হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর চারিত্রিক গুণাবলী বিষয়ে একটি প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। সেই প্রবন্ধে তিনি তাঁর (আ.) নানান গুণের কথা এভাবে উল্লেখ করেন:

"হযরত মসীহ মওউদ (আ.) নিতান্তই মমতাময় ও দয়ালু ছিলেন, দানশীল ছিলেন, অতিথি আপ্যায়নকারী ছিলেন, সর্বোচ্চ সাহসী ছিলেন। পরীক্ষার সময় যখন লোকেরা হতাশ-নিরাশ হয়ে যেতো, তিনি বাঘের ন্যায় অগ্রসর হতেন। ক্ষমা করা, চোখ অবনত রাখা, উদারতা, বিনয়, বিশ্বস্ততা, সরলতা, প্রভুভক্তি, রসুলপ্রেম, ধর্মের সম্মানিত ব্যক্তিদের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা, প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করা, উত্তম সামাজিক আচরণ, মর্যাদাবান, আত্মাভিমানী, সাহসী, দৃঢ়চেতা, উত্তম আচরণের অধিকারী এবং ভাগ্যবান –এসব তাঁর সর্বোত্তম গুণাবলীর মাঝে অন্তর্ভুক্ত। হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-কে আমি ঠিক সে সময় দেখেছি যখন আমার বয়স কেবল দু'বছর। এরপর তিনি আমার চোখ থেকে সেদিন অদৃশ্য হয়েছেন, যখন আমি ২৭ বছরের টগবগে যুবক। কিন্তু আমি খোদার কসম খেয়ে বলছি, আমি তাঁর চেয়ে উত্তম, তাঁর চেয়ে উত্তম চারিত্রিক-গুণাবলীর আধিকারী, তাঁর চেয়ে অধিক পুণ্যবান, তাঁর চেয়ে অধিক মমতাময়, আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের প্রেমে তাঁর চেয়ে অধিক বিভোর কোন ব্যক্তিকে দেখি নি। তিনি এমন এক নূর ছিলেন, যিনি মানবজাতির কল্যাণে এ জগতে প্রকাশিত হয়েছিলেন, আর দয়ার এক বৃষ্টি ছিলেন, যা দীর্ঘকাল এ জগতের শুষ্ক ঈমানের ভূমিতে বর্ষিত হয়েছে এবং এ ঈমানের জমিনকে সবুজ-শ্যামলে রূপান্তরিত করে গেছেন।" *(সিরাতুল মাহদী, দ্বিতীয় খণ্ড, ৯৭৫ নং রেওয়ায়েত, পৃ. ৮২৪-৮২৭)*

আল্লাহ্‌র প্রেরিত সকল মহা পুরুষের ন্যায় হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)-এর হৃদয় ছিল দয়া-মায়ায় পরিপূর্ণ এবং স্বভাব ছিল নরম ও কোমল। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) দয়া-মায়া ও সহমর্মিতার আকর ছিলেন। হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর পবিত্র জীবনে নিজ জামাতের সদস্যদের জন্য দয়া-মায়া ও সমবেদনা আর তাদের প্রতি ভালোবাসার অগণিত হৃদয়গ্রাহী এবং ঈমান-উদ্দীপক ঘটনা পাওয়া যায়। নিজ শিষ্য ও সেবকদের প্রতি হযরত মসীহ মওউদ (আ.) কতটা দয়ালু ও মমতাময় ছিলেন আর কীভাবে তাদের দু:খ-কষ্টের খবর পাওয়া

মাত্র অস্থির ও বিচলিত হতেন আর নিজে বিগলিত চিত্তে কান্নাকাটি করে দোয়া করতেন এবং প্রজ্ঞার সাথে চেষ্টা প্রচেষ্টা করে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করতেন, এমন শত শত ঘটনা পাওয়া যায়। এখানে কেবল কয়েকটি উল্লেখ করা সম্ভব হবে।

হযরত মুফতি ফযলুর রহমান সাহেব ভেরভী (রা.) বলেন: ১৮৯৮ সালে আমার জ্বর হয়। পনেরতম দিনে এশার সময় হযরত মৌলভী নুরুদ্দীন সাহেব দেখতে এলেন। সে মুহূর্তে আমি প্রচন্ড জ্বরে প্রলাপ বকছিলাম। বাড়ী থেকে বের হয়ে তিনি মৌলভী কুতবুদ্দীন সাহেবকে বললেন যে, আজ তার অবস্থা খুবই সংকটাপন্ন, বিপদ আসন্ন মনে হচ্ছে। পর্দার পেছন থেকে আমার স্ত্রী শুনছিল। সেই মুহূর্তেই সে হযরত সাহেবের কাছে দৌড়ে গেল এবং নিবেদন করে বলল, আপনি কিছু একটা করুন, ফযলুর রহমান সাহেবের অবস্থা সংকটাপন্ন। তখন তিনি কোন পুস্তক লেখার কাজে নিমগ্ন ছিলেন। আমার স্ত্রীর কথা শুনে বললেন, আমি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় লিখছি, আমি মৌলভী সাহেব (হযরত হাকীম মৌলভী নুরুদ্দীন সাহেব)-কে বলে দিয়েছি, তিনি যেন খুব মনোযোগ দিয়ে চিকিৎসা করেন। তিনি বললেন, মৌলভী সাহেব আজ প্রায় নিরাশা ব্যক্ত করে বিদায় নিয়েছেন। এখন মনিবের কথা শুনুন যে, ভৃত্যের জন্য তিনি কতটা ব্যাকুল হলেন! উল্লিখিত হযরত মুফতি সাহেব বলেন, এ কথা শুনে হযরত সাহেব সেই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় লেখা স্থগিত করলেন এবং বললেন, 'তার কাছ থেকে আমার এখনো অনেক কাজ নেয়া বাকি আছে। তুমি যাও, আমি এখনি তার জন্য দোয়া করছি।' অতএব তিনি ঘরে চলে আসলেন। রাত বারোটার সময় আমার একবার রক্ত আমাশয় হলো। এরপর দ্বিতীয়বারও হলো, অতঃপর আমার চোখ খুলে গেল। এরপর তৃতীয়বার রক্ত আমাশয় হলো। সকালে মাষ্টার আব্দুর রহমান জলন্ধরি আমার কাছে আসলেন আর বললেন, ফজরের নামাযের পর হযরত সাহেব মৌলভী আব্দুল করিম শিয়ালকোটি সাহেবকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, 'রাতে যখন আমি জানতে পেরেছি যে, ফযলুর রহমানের অবস্থা সংকটাপন্ন। তখন দোয়ার দিকে আমার মনোযোগ নিবদ্ধ হলো আর আমি বারোটা পর্যন্ত সিজদায় থাকলাম। আমাকে বলা হলো "আরোগ্য লাভ হয়েছে।" আমি জানি না এর কী অর্থ? কে যাবে আর খবর নিয়ে আসবে।' তাই আমি নিজে এসেছি। তিনি বলেন, আমার মাঝে কথা বলার শক্তি ছিল না। কিন্তু ইশারায় বললাম, বারোটা থেকে উপশম হতে শুরু করেছে।

হযরত মুফতি ফযলুর রহমান সাহেবেরই বর্ণনাকৃত আরেকটি ঘটনা: যা পূর্বের ঘটনার চেয়ে আরও বেশি ঈমান-উদ্দীপক। এটি সেসময়ের ঘটনা, যখন তাঁর (রা.) ঔরসে পুত্র আব্দুল হাফিজের জন্ম হয়। শীতকাল ছিল আর তখন প্রসূতি মহিলারা খিঁচুনি রোগে মারা যাচ্ছিল। তিনি বলেন: "আমার স্ত্রীর সন্তান জন্মদানের সপ্তম দিন মাগরিব নামাযের কাছাকাছি সময়ে সেই রোগের লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল। সে দিনগুলোতে এটি মহামারী আকারে চলছিল তাই তার প্রতি বিশেষ মনোযোগ নিবদ্ধ ছিল। মাগরিব নামাযের পর আমি হযরত সাহেবের কাছে দৌড়ে গেলাম এবং তাঁকে ঘটনা খুলে বললাম। তিনি (আ.) বললেন, এ তো অতি ভয়ংকর রোগের পূর্ব লক্ষণ, তুমি তাকে এক্ষণি দশ রতি হিংগ (এক প্রকার ঔষধ) খাওয়াও আর এক-দেড় ঘন্টা পর আমাকে খবর জানাও। এশার নামাযের পর আমি পুনরায় উপস্থিত হলাম এবং আরয করলাম যে, রোগ বেড়ে চলেছে। তিনি বললেন, দশ রতি কুইনাইন খাইয়ে দাও এবং এক ঘন্টা পরে আমাকে জানাও।

হুজুরের নিজ শিষ্যদের জন্য দয়ামায়া, মমতা দেখুন। হযরত মুফতি সাহেব বলেন যে, হুজুর সাথে সাথে এও বললেন, মনে করো না যে, আমি ঘুমিয়ে পড়েছি, নির্দ্বিধায় চলে আসবে এবং সিঁড়িতে জোরে জোরে আওয়াজও করবে। মুফতি সাহেব বলেন: "এক ঘণ্টা পর আমি পুনরায় গেলাম এবং জানালাম যে, কোন উন্নতি হয় নি। তিনি বললেন, দশ রতি কস্তুরি খাইয়ে দাও। আমি বললাম, এ মুহূর্তে কস্তুরি কোথায় পাবো? হুজুর (আ.) নিজে কস্তুরি নিয়ে এলেন এবং বললেন, এখানে দশ রতি কস্তুরি হবে। আমি বললাম, হুজুর এখানে অনেক বেশি আছে। তিনি বললেন, নিয়ে যাও, পরে কখনো কাজে লাগবে। আমি তা নিয়ে গেলাম এবং দশ রতি কস্তুরি রোগীকে খাইয়ে দিলাম। এক ঘন্টা পরে পুনরায় হুজুরের কাছে গেলাম এবং বললাম অসুস্থতা আরও বেড়ে গেছে। তিনি বললেন, দশ তোলা ক্যাসট্রোয়েল দিয়ে দাও। আমি এসে দশ তোলা ক্যাসট্রোয়েল দিলাম। এরপর তার প্রচণ্ড বমি হলো। বমিই হলো এই রোগের সর্বশেষ অবস্থা। বমির পর তার নিঃশ্বাস আটকে গেল, মাথা পেছনের দিকে কষে গেল, চোখে অন্ধকার দেখতে লাগলো এবং কথা বন্ধ হয়ে গেল।" বাহ্যিক এই অবস্থা নিরাশারই ছিল, যেগুলো দেখে মানুষ বুঝে ফেলে, এখন খোদার নির্ধারিত আদেশে সন্তুষ্ট থাকা উচিত। এদিকে খোদার প্রত্যাদিষ্ট ব্যক্তির দাসের নিজ মনিবের দোয়ার প্রতি এমনই ভরসা ছিল যে, তিনি বলতে লাগলেন, আমি দৌড়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগলাম। হুজুর আমার পায়ের শব্দ শুনে দরজা খুলে দিলেন এবং বললেন, কী অবস্থা, সব ঠিক আছে তো? তিনি সমস্ত ঘটনা জানালেন। সমস্ত ঘটনা শুনে তিনি (আ.) বললেন আর কতই না চমৎকারভাবে বললেন: "জাগতিক যত অস্ত্র ছিল, আমরা সবটা ব্যবহার করেছি। এখন একটি মাত্র অস্ত্র

অবশিষ্ট আছে, আর তা হলো দোয়ার অস্ত্র। তুমি যাও, আমি দোয়া থেকে তখনই মাথা তুলব যখন জানব যে, সে সুস্থ হয়েছে।"

হযরত মুফতি সাহেব বলেন, রাত তখন দুইটা বেজে গেছে। আমি এ কথা শুনে ফেরত চলে এলাম আর স্ত্রীকে এ কথা বলে যে, এখন ঠিকাদার তার ঠিকা স্বয়ং নিয়েছেন। দ্বিতীয় কামরায় গিয়ে খাটে শুয়ে পড়লাম এবং ঘুমিয়ে পড়লাম। সকালে ডেক-ডেকচির আওয়াজে আমার ঘুম ভাঙলো। দেখলাম, আমার স্ত্রী থালাবাটি বা ডেকডেকচি ধোয়ামাজা করছে। আমি তার শারিরীক অবস্থা জিজ্ঞেস করলে আমাকে বলল, আপনি তো গিয়ে ঘুমিয়ে গিয়েছিলেন, এর ঠিক দু'ঘন্টা পর আল্লাহ্ তা'লা আমাকে সুস্থ্য করে দিয়েছেন। *[সীরাতে আহমদ, লেখক–মৌলভী কুদরতুল্লাহ সানওয়ারী (রা.), পৃ. ১৭১-১৭২]*

এ ঘটনাবলী দ্বারা জামাতের সদস্যদের প্রতি হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর দয়ামায়ার সাথে সাথে আল্লাহ্ তা'লার সত্ত্বার প্রতি তাঁর ভরসা, দোয়ার প্রতি আস্থা আর খোদা তা'লার কুদরতের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস স্পষ্টত লক্ষণীয়। আর আমাদের জন্যও এখানে শিক্ষণীয় বিষয় হলো, আমাদেরও এমন ঈমান এবং বিশ্বাস অর্জন করার আর এমনি ভালোবাসা আর সহানুভুতি নিজ মোমেন ভাইদের জন্য নিজেদের হৃদয়ে সৃষ্টির চেষ্টা করা উচিৎ।

সহায় সম্বলহীন এক ছেলের প্রতি আন্তরিক মমত্ববোধ প্রদর্শন: আব্দুল করীম নামক এক ছেলে শিক্ষা অর্জনের জন্য কাদিয়ান আসে। ঘটনাচক্রে তাকে এক পাগল কুকুর কামড় দেয়। চিকিৎসার জন্য তাকে কসূলী প্রেরণ করা হয়। সেখান থেকে সে চিকিৎসা নিয়ে সুস্থ্য হয়ে কাদিয়ান ফিরে আসে। এর কিছু দিন পর তার জলাতঙ্ক রোগের লক্ষণ দেখা দেয়। হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-কে সেই অসহায় ছেলের অবস্থা সম্পর্কে অবগত করা হলে তিনি (আ.) ভীষণ ব্যাথিত হন। কসূলীতে টেলিগ্রাম মারফত সেই ছেলের চিকিৎসা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে উত্তরে জানানো হয়, এর কোন চিকিৎসা নাই। এটি শুনে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এই দুস্থ, অসহায়, ঠিকানাহীন ছেলের জন্য এতটা অস্থির ও বিচলিত হলেন যে, নিকটাত্মীয়রাও এতটা বিচলিত ও অস্থির হয় না। কিছুক্ষণ পর পর তিনি (আ.) সেই ছেলের খবর নিতে থাকেন আর নিজ হাতে ঔষধ তৈরী করে প্রেরণ করতে থাকেন। আপন শিষ্যের জন্য মসীহ মওউদ (আ.)-এর এই অস্থির চিত্তে দোয়া ও চেষ্টা-প্রচেষ্টার ফলেই আল্লাহ্ তা'লা তাকে নিদর্শনমূলক আরোগ্য দান করেন। (সীরাতে হযরত মসীহ মওউদ, পৃষ্ঠা ২৯১-২৯২, লেখক-ইয়াকুব আলী ইরফানী, সংক্ষেপিত)

হযরত শেখ জয়নুল আবেদিন সাহেব বর্ণনা করেন: আমার স্ত্রীর বন্ধ্যাত্ব রোগ ছিল এবং চার ছেলে মারা গিয়েছিল, চিকিৎসায় ভালো হতো না। আমি হযরত সাহেবের কাছে উপস্থিত হলাম। হুজুর বললেন, মিয়া জয়নুল আবেদিন! তুমি এতদিন আমাকে কেন জানাও নি? তোমরা স্বামী-স্ত্রী তো চার বছর জাহান্নামে পড়ে ছিলে। আমাকে তৎক্ষনাৎ জানানো উচিৎ ছিল। এরপর বললেন, মৌলভী নুরুদ্দীন সাহেবের কাছে চিকিৎসা করাও, রোগ ইনশাআল্লাহ্ ভালো হয়ে যাবে। আমি আরয করলাম, হুজুর আমার অতটা সামর্থ্য নেই, আমি হতদরিদ্র, মৌলভী সাহেবের কাছে চিকিৎসা করাতে পারবো না। বললেন, তুমি কি চাও আমি চিকিৎসা করি? সে বলল, না। হুজুর বললেন, তাহলে কী চাও? বলল, হুজুর দোয়া করুন। হযরত সাহেব দরজাতেই দাঁড়িয়ে গেলেন এবং হাত উঠিয়ে দোয়া করা শুরু করলেন। তিনি (আ.) বললেন, আপনিও দোয়া করুন, আমিও দোয়া করছি। যোহরের নামাযের পর থেকে আসরের আযান পর্যন্ত হুজুর দোয়া করলেন আর যতক্ষণ দোয়া করেছেন, ততক্ষণ কান্নাকাটি করেছেন। অশ্রু হুজুরের পবিত্র দাড়ি বেয়ে টপ টপ করে নিচের চৌকাঠে পড়তে লাগলো। আমি ক্লান্ত হয়ে দেয়ালে ঠেক দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলাম আর মনে মনে ভাবছিলাম, হুজুরকে কেন আমি এতটা কষ্ট দিতে গেলাম? সন্তান না হলে না হতো, কিন্তু হুজুরকে এতটা কষ্ট দেয়া আমার উচিৎ হয় নি। যাহোক, হুজুর দোয়া শেষ করলেন আর বললেন, তোমার দোয়া কবুল হয়ে গেছে এবং হাটকুড়ো রোগ দূরীভুত হয়ে গেছে। এবারকার গর্ভধারণে তোমার পুত্র লাভ হবে। তোমার পুত্র ও স্ত্রীর চেহারা আমাকে দেখানো হয়েছে। তুমি কোন চিন্তা করো না। এরপর তিনি (আ.) বললেন, আল্লাহ্ তা'লা কৃপা করবেন, বন্ধ্যাত্ব রোগ আর কখনোই হবে না। এখন কি আমার ভিতরে প্রবেশের অনুমতি আছে? . . দু'চার বছর পর হুজুর জিজ্ঞাসা করলেন, মিয়া জয়নুল আবেদিন সাহেব! সন্তান কি হয়েছে? আমি বললাম, হুজুর! এখন তো সন্তান হচ্ছে আর এ তো হুজুরের দোয়ার ফল। হুজুর বললেন, আমি আবার কবে দোয়া করলাম? আমার তো মনে নেই। তখন আমি হুজুরকে স্মরণ করালাম। খোদা তা'লার কৃপায় দোয়ার পর আজ পর্যন্ত আমার কোন সন্তান মারা যায় নি, এখন আমার চার ছেলে এবং তিন মেয়ে জীবিত আছে। *(রেজিষ্টার রেওয়ায়েতে সাহাবা, একাদশ খণ্ড)*

হযরত মির্যা বশির আহমদ সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন: মুসাম্মাৎ আমাতুল্লাহ বিবি, যিনি কাবুলের খোস্ত এলাকার অধিবাসী, তিনি আমার কাছে বর্ণনা করেন যে, শুরুর দিকে যখন তিনি তার পিতা এবং চাচা যথাক্রমে সাইয়্যেদ নূর সাহেব এবং সাইয়্যেদ আহমদ নূরের সাথে কাদিয়ান আসেন, তখন তার

বয়স খুব কম ছিল আর তার পিতা-মাতা এবং চাচা-চাচী হযরত সাইয়্যেদ আব্দুল লতিফ সাহেব শহীদ (রা.)-এর শাহাদাতের পর কাদিয়ান চলে আসেন। শৈশবে মোসাম্মৎ আমাতুল্লাহর চোখে প্রচণ্ড গোলযোগ দেখা দিত আর চোখের কষ্ট এতটাই বেড়ে যেত যে, প্রচণ্ড ব্যাথা এবং চোখ লাল হয়ে যাওয়ার জন্য চোখ খোলার শক্তিটুকু তিনি পেতেন না। তার পিতা-মাতা তার অনেক চিকিৎসা করিয়েছিলেন কিন্তু কোন লাভ হয় নি, বরং কষ্ট বৃদ্ধিই পেয়েছে। একদিন তার মাতা যখন তাকে ধরে চোখের ভিতর ঔষধ ঢেলে দিতে লাগলেন, তখন তিনি ভয়ে এ কথা বলতে বলতে পালিয়ে গেলেন যে, আমি হযরত সাহেবের কাছে দম করাব। তিনি বর্ণনা করেন, আমি দৌড়িয়ে হযরত সাহেবের ঘরে গিয়ে পৌঁছলাম আর কাঁদতে কাঁদতে হুজুরের সামনে নিবেদন করলাম, আমার চোখে ভীষণ কষ্ট আর ব্যাথা ও লাল হবার দরুণ আমি খুব অস্থির হয়ে পড়ি আর চোখ খুলতে পারি না। আপনি আমার চোখে দম করে দিন। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) দেখলেন, সত্যিই আমার চোখ ভয়ংকর ভাবে লাল হয়ে ছিল আর আমি ব্যাথায় কাতরাচ্ছিলাম। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) মুখ থেকে আঙুলে সামান্য লালা নিলেন আর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে (সম্ভবত হুজুর মনে মনে দোয়া করছিলেন) খুব আদরের সাথে, মমতার সাথে নিজ আঙুল আমার চোখের উপর ধীরে ধীরে বুলিয়ে দিলেন আর আমার মাথায় হাত রেখেন বললেন: "মামনি যাও, খোদার দয়ায় আর কখনো তোমার চোখের এ কষ্ট হবে না"। মুসাম্মাৎ আমাতুল্লাহ বর্ণনা করেন, এর পর থেকে আজ পর্যন্ত (বর্তমানে আমি সত্তর বছরের বৃদ্ধা) কখনো একবারের জন্যও আমার চোখে ব্যাথা হয় নি আর হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর দমের বরকতে আমি চিরদিনের জন্য একেবারেই সুরক্ষিত রয়েছি, অথচ ইতিপূর্বে অধিকাংশ সময় আমার চোখ ব্যাথা করতো আর আমি অনেক কষ্ট সহ্য করতাম। তিনি আরও বলেন, হযরত মসীহ মওউদ (আ.) যখন আমার চোখের উপর তাঁর মুখের লালা নিয়ে আরাম করে বুলিয়ে দিচ্ছিলেন, তখন আমার বয়স ছিল মাত্র দশ বছর। মোটকথা, বিগত ষাট বছরের এই সুদীর্ঘ সময় হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সেই আধ্যাত্মিক তাবিজ সেই কাজ করে দেখিয়েছে, যা আজ পর্যন্ত কোন ঔষধ করে দেখাতে পারবে না।

হযরত সাহেবযাদা মীর্যা বশির আহমদ সাহেব বর্ণনা করেন, বন্ধুদের স্মরণ রাখা উচিত, দম করার পদ্ধতি মূলত দোয়ারই একটি ধরন। তিনি আরো বলেন, দম পদ্ধতি বিষয়ে এ বিষয়টিও উল্লেখ করা প্রয়োজন এবং বন্ধুদের স্মরণ রাখা উচিৎ যে, আসলে এ চিকিৎসা-পদ্ধতি হুজুর পাক (সা.) এবং হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর কোন কোন সময়ের কর্ম দ্বারা প্রতীয়মাণ। কিন্তু এটি অধিকহারে ব্যবহার করা এমনকি তন্ত্র-মন্ত্র বানিয়ে নেয়া কোন মতেই সমীচীন নয়। কেননা, অসাবধানতার পরিণামে এর মাধ্যমে অনেক বিদ'আতের পথ খুলে যেতে পারে। উত্তম হলো, যেভাবে পবিত্র কুরআন বলে, দোয়ার বৈধ পদ্ধতি গ্রহন করা হোক আর কখনো যদি চিকিৎসার জন্য দম করার প্রয়োজন পড়ে, তাহলে কোন পুন্যবান, খোদাভীরু এবং আধ্যাত্মিক বুযুর্গের দ্বারা দম করানো যেতে পারে, অন্যথায় যেভাবে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেছেন সেটিই হতে পারে তথা কল্যাণের পরিবর্তে অকল্যাণের পথ খুলে যেতে পারে।

হযরত মৌলভী আব্দুল করীম সাহেবের প্রতি অগাধ ভালোবাসার ধরণঃ হযরত আব্দুল করীম সাহেব ১৯০৫ সালের আগষ্ট মাসের তৃতীয় সপ্তাহে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। তার কাঁধে একটি ফোঁড়া হয়। যা অপসারণের জন্য কয়েক দফা অপারেশন করার প্রয়োজন হয়। বেশখানিকটা ক্লোরোফরম ব্যবহার করা এবং প্রচুর রক্ত ক্ষরণের ফলে তাঁর অবস্থা সংকটাপন্ন হয়ে পড়ে।

হযরত ডাক্তার মির্যা ইয়াকুব বেগ সাহেব বলেন, হযরত মৌলভী সাহেবের এই অবস্থা সম্পর্কে আমি অবগত হয়ে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-কে যে বেদনা অনুভব করতে দেখেছি তা কোন পিতা-মাতা তাদের প্রিয় সন্তানের জন্য যে কষ্ট ও বেদনা অনুভব করে তার চেয়ে কম ছিল না বরং এই মসীহকে তাঁর আধ্যাত্মিক সন্তানের জন্য এর চেয়ে বেশি কষ্ট পেতে দেখেছি। তারপর তিনি ভিতরে প্রবেশ করেন। কিছু কস্তুরী (মৃগনাভী) নিয়ে এসে বলেন, মৌলভী সাহেবকে দিন। তারপর তিনি দোয়ায় রত হয়ে যান।

ইয়াকুব আলী ইরফানী সাহেব বলেন, হযরত মসীহ মওউদ (আ.) মৌলভী সাহেবের অপারেশনের পর থেকে রাতের বেলা ঘুমানোকে নিজের জন্য এক প্রকার হারামই করে ফেলেন। তিনি (আ.) মাথা ব্যথ্যায় আক্রান্ত ছিলেন। কিন্তু এই কোমল হৃদয়ের অধিকারী সারা রাত দয়ালু প্রভূ-প্রতিপালকের সমীপে মৌলভী সাহেবের জন্য দোয়ায় লেগে থাকতেন। এই দয়া-মায়া ও আত্মত্যাগ কোন সাধারণ লোকের পক্ষে সম্ভব নয়। এটি কেবল আল্লাহ্ তা'লার মনোনীত এবং প্রত্যাদিষ্ট ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব, যিনি নিজ কষ্টকে অন্যের খাতিরে ভুলে যাবেন, এমনকি মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে উপনীত হবেন। হযরত আকদাস (আ.) রাতের মধ্যভাগ থেকে ঊষার উদয় পর্যন্ত দোয়ায় রত থাকতেন এবং মৌলভী সাহেবের বাড়ির দরজায় এসে অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতেন। সমস্ত দুনিয়া ঘুমিয়ে থাকত কিন্তু খোদা তা'লার এই সিংহ জাগ্রত থাকতেন; নিজের জন্য নয়, নিজ সন্তানের জন্য নয়, নিজ স্বার্থসিদ্ধির লক্ষ্যেও নয়

কেবল দয়ালু ও কৃপালু খোদার সমীপে নিজ শিষ্যের আরোগ্যের জন্য দোয়া করার উদ্দেশ্যে।

অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে, তিনি (আ.) কয়েক রাত না ঘুমিয়ে কাটান। ফলশ্রুতিতে তাঁর (আ.) স্বাস্থ্যের উপর এর প্রভাব পড়ে এবং তিনি (আ.) খুবই দূর্বল হয়ে পড়েন। এই দূর্বলতাও তাঁকে দমাতে পারেনি। একদিন তিনি বলেন, আমি অনেক দোয়া করেছি। এত দোয়া করেছি যে, যদি এটি অটল তকদীর না হয়ে থাকে তবে ইনশাআল্লাহ্ অনেক উপকার হবে। তারপর তিনি (আ.) বলেন, আমি আল্লাহ্ তা'লার কসম খেয়ে বলছি, আমি আমার সন্তানদের জন্যও কখনো এমন অস্থির ও দুশ্চিন্তাগ্রস্থ হই নি।

তিনি কেবল নিজেই দোয়াতে ব্যস্ত ছিলেন না বরং অন্যান্য খোদ্দামদের ডেকে বলেন, তোমরা সারা রাত দোয়া কর। আর এভাবে তোমরা তোমাদের ভাইয়ের সাহায্য কর।

দয়া-মায়ার এই মূর্তিমান পুরুষের অবস্থা চিন্তা করুন! নিজ শিষ্যের জন্য তাঁর ব্যকুলতা দেখুন! তিনি (আ.) এক সকাল বেলা বলেন, "আমি ক্ষণে ক্ষণে চাইতাম, দু'-চার মিনিটের জন্য ঘুমাই। কিন্তু আমি জানিনা ঘুম কোথায় উড়ে গেল!" । তখন সেবকরা আরয করেন, হুযুর! এখন গিয়ে বিশ্রাম নিন। তিনি (আ.) বলেন, "এটি আমার এখতিয়ারের বাইরে। আমি কীভাবে আরাম করতে পারি যেখানে কি-না আমার দরজার সামনে থেকে 'হায়! হায়!' আওয়াজ আসছে। আমি তো সেই ব্যাথা-বেদনা ও কষ্টও দেখতে পারব না যা মৌলভী সাহেব পেয়েছেন। এজন্য আমি উপরেও যাই নি।" (সীরাতে মসীহ মওউদ, পৃষ্ঠা ১৯০-১৯৪, লেখক: ইয়াকুব আলী ইরফানী)

এক এতিম বালকের প্রতি সহানুভূতি ও শুশ্রূষা: এই ঘটনা বর্ণনা না করলে তাঁর এই গুণের বর্ণনা অপূর্ণই থেকে যাবে। 'ফিযা' নামি এক এতিম বালক ছিল। পূর্বে সে মির্যা নিযামুদ্দীন সাহেবের ঘরে থাকত। কিন্তু তাদের কঠোরতা সহ্য করতে না পেরে সে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাড়িতে চলে আসে। সে নিরক্ষর, রাগী এবং আদব-কায়দা সর্ম্পকে অনবহিত ছিল। একবার নিজের অসচেতনতার কারণে ফুটন্ত গরম পানি তার সমস্ত শরীরে পড়ে যায়। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) তা শুনে ততটাই ব্যথিত হন যতটা তাঁর নিজ পুত্রের জন্য ব্যথিত হতেন।

তিনি (আ.) সার্বক্ষণিক তার শুশ্রূষায় নিয়োজিত থাকেন। সেই বালকের সারা শরীরে সদ্য ধুনা তুলা দিতেন এবং সাবধানতার সাথে দেখাশুনা করতেন। তিনি (আ.) সেই বালকের চিকিৎসার জন্য টাকা খরচ করতে কৃপণতাও করেন নি এবং নিজ হাতে কাজ করতে কুণ্ঠাবোধও করেন নি। তার দেখাশুনা, খাবার ও ঔষধের ব্যাপারে কোন কমতি করেন নি। স্বয়ং নিজে উপস্থিত থেকে সব কিছুর ব্যবস্থা করতেন। তাকে সর্বদা শান্তনা দিতেন আর বলতেন, 'যদি এই দুর্ঘটনা থেকে সে বেঁচে যায় তবে সে পুণ্যবান হবে।' পরিশেষে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর এই কথা বাস্তবে রূপায়িত হয়।

সবাই জানে, তখন সে এক ময়লা ও নোংরা দেহের এতিম বালক ছিল, কোন উচ্চ বংশের সাথেও তার পারিবারিক সম্পর্ক ছিল না। এমন চরম বিপদের সময় নিকটাত্মীয়রাও বিরক্ত ও ক্লান্ত হয়ে যায়। কিন্তু হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এক দীর্ঘ সময় তার চিকিৎসা ও সেবা-শুশ্রূষায় নিজের মূল্যবান সময় ব্যয় করেছেন। কেবল নিজেই তার সেবায় লেগে ছিলেন না বরং বাড়ির সবাইকে এই দিক-নির্দেশনা দিয়েছিলেন যে, তার আরাম-আয়েশ এবং চিকিৎসায় যেন কোন কমতি না থাকে। এতিমদের লালন-পালন এবং তাদের সেবা-শুশ্রূষার এটি একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। *(সীরাতে মসীহ মওউদ, পৃষ্ঠা ২৮৮-২৮৯, লেখক: ইয়াকুব আলী ইরফানী)*

পরিশেষে আমরা এটিই বলতে পারি, হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সত্তা ছিল এক মুর্তিমান রহমত স্বরূপ। তিনি রহমত ছিলেন নিজ আত্মীয়ের জন্য আর রহমত ছিলেন নিজ বন্ধুদের জন্য, রহমত ছিলেন নিজ শত্রুর জন্য আর রহমত ছিলেন নিজ প্রতিবেশীর জন্য, আর রহমত ছিলেন নিজ ভৃত্যদের জন্য আর রহমত ছিলেন যাচনাকারীদের জন্য আর রহমত ছিলেন সর্বসাধারণের জন্য, আর জগতে কোন ছোট বা বড় দল এমন নেই যাদের জন্য তিনি রহমতের সুবাস না ছড়িয়েছেন। তিনি রহমত ছিলেন ইসলামের জন্য, যার সেবা, প্রচার ও প্রসার এবং যাকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য তিনি আত্মোৎসর্গীকৃত অবস্থায় নিজ জীবনের প্রত্যেকটি মুহূর্ত বরং নিজ জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করেছিলেন।